বাঁকুড়া জেলায় রাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিবর্তন : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

সন্তোষ লাহা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর
সত্যসৌরভ জানা
তত্ত্বাবধায়ক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর
মনোজ মণ্ডল
সহ-তত্ত্বাবধায়ক, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর

সারসংক্ষেপ:-বাঁকুড়া জেলা লাল মাটির এক সমৃদ্ধ অঞ্চল, এই অঞ্চলের লাল মাটির আঁচলে যেমন টেরাকোটা শিল্প, ছৌ-নাচ, লোকসংগীত এবং পুজো-পার্বণের মুগ্ধ আবহ ধরা পড়ে, তেমনি জনমনে প্রবাহিত হয় মধ্যযুগীয় রাজাদের বীরত্ব ও ঐতিহ্যের কাহিনি । দামোদর দারকেশ্বর এবং কংসাবতী নদী বয়ে নিয়ে চলেছে যুগের পর যুগের ইতিহাসের ধারা, যার একাংশ আজও অজানা। বাঁকুড়া জেলার অলিতে গলিতে শুনতে পাওয়া যায় রাজবাড়ির কথা, রাজাদের কথা, রাজাদের যুদ্ধের কথা, কোনো কোনো রাজা অস্ত্রচালনায় পটু না হলেও ছিলেন প্রজাবৎসল। অনেক রাজা শুধুই দৈবশক্তির উপর ভিত্তি করে রাজত্ব চালিয়েছেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী বহু কাহিনির প্রচলন রয়েছে। প্রতিটা রাজার আবির্ভাবের পশ্চাতে জড়িয়ে রয়েছে গভীরতর ইতিহাস। ধারাবাহিক ভাবে সেই সমস্ত রাজন্য ইতিবৃত্তের ওপর আলোকপাত করাই হল এই অধ্যয়নটির মূল উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: বাঁকুড়া জেলা, শিলালিপি, রাজতান্ত্রিক, চন্দ্রবর্মা, পুষ্করণ, জনগোষ্ঠীর, ভূম-রাজ্য, বরাহভূম, সামন্তভূম, মানভূম, তুঙ্গভূম, শিখরভূম, মল্লভূম, ধবলভূম।

মূল আলোচনা : অরণ্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশেই হল কান্তারময় বাঁকুড়া জেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং আদিম অরণ্যজীবনের অন্তঃস্থল থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বাঁকুড়া জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহবর্মনের পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মনের শিলালিপি খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে এই অঞ্চলে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত । তবে চন্দ্রবর্মা শাসিত পুষ্করণ রাজ্যের অস্তিত্ব খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধেই লুপ্ত হয়ে যায়। এর পর দীর্ঘ সময় ধরে বাঁকুড়া জেলায় রাষ্ট্রীয় বিকাশের ধারায় একপ্রকার স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীতে দ্বারকেশ্বর নদের উপকণ্ঠে বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গভীর বনভূমিতে একটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সংবাদ পাওয়া যায়। এরপর ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার চোড়গঙ্গ বংশীয় রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ কর্তৃক মন্দারন রাজ্য আক্রমণ, এবং ১২০১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মহম্মদ ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া অভিযান এবং চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সুলতান ফিরুজ শাহের শাসনকালে শিখর রাজ্যের বিরুদ্ধে দিল্লির অভিযান—এই সকল ঘটনাবলি বাংলার সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বিকাশের ধারায় এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে।[১]

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় রাষ্ট্রীয় বিকাশের ইতিহাসে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়কালে বাঁকুড়া–পুরুলিয়া অঞ্চলের দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতী নদী উপত্যকায় বসবাসকারী কৃষ্ণকায় অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতিদের নেতৃত্বে একাধিক ‘ভূম-রাজ্য’ গড়ে ওঠে। বাঁকুড়া জেলায় এইরূপ চারটি ভূমরাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যে গুলি হল —

১) মল্লভূম:- মল্লভূম এর অন্তর্গত ছিল বাঁকুড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, কোতুলপুর ও ইন্দাস থানা অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত বিষ্ণুপুর পরগণা।

২) ধবলভূম:- ধবলভূম এর অন্তর্গত ছিল বর্তমান খাতড়া রানীবাঁধ থানা অঞ্চল নিয়ে গঠিত অম্বিকানগর পরগণা ।

৩) তুঙ্গভূম:- তুঙ্গভূম এর অন্তর্গত ছিল রাইপুর থানার দক্ষিণাংশ বা শ্যামসুন্দরপুর পরগণা।

৪) সামন্তভূম:- সামন্তভূম এর অন্তর্গত ছিল ছাতনা থানা অঞ্চল বা ছাতনা পরগণা।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ভবিষ্য পুরাণে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় রাষ্ট্রীয় তন্ত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে সাতটি ভূমরাজ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- ১) বরাহভূম ২) সামন্তভূম ৩) মানভূম ৪) তুঙ্গভূম ৫) শিখরভূম ৬) মল্লভূম ৭) ধবলভূম।

বাঁকুড়া জেলায় রাষ্ট্রীয় বিকাশের ধারা তৎসহ বাঁকুড়া জেলার আঞ্চলিক রাজপরিবারগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়টির বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

মল্লভূম :- মধ্যযুগের মল্লভূম রাজ্যটির উৎপত্তি হয়েছিল বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশের সুবিস্তৃত এলাকা নিয়ে । বীর গুনের কোটাটবী রাজ্যের অবলুপ্তির পর দ্বাদশ শতাব্দীতে মল্লভূমে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় সর্দার শাসিত রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এই ধরনের স্থানীয় সর্দার শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জয়পুর থানার অন্তর্গত প্রদ্যুম্নপুর বা পদুমপুর রাজ্য, ইন্দাস থানার অন্তর্গত যোথবিহার রাজ্য,এটি ছিল পদুমপুরের করদ রাজ্য । এবং কোতুলপুর থানার অন্তর্গত লাউগ্রাম রাজ্য ।এক মল্ল বাগদি সর্দারের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল এই লাউগ্রাম রাজ্যটি ।এটি ছিল পদুমপুরের অনুগত একটি রাজ্য। সময়ের প্রেক্ষিতে অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় সর্দারশাসিত রাজ্যগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে লাউগ্রামের মল্ল বাগদি রাজা মল্লভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবিসংবাদিত শক্তিতে পরিণত হন এবং মল্ল রাজধানী স্থানান্তরিত হয় বন বিষ্ণুপুরে । এইভাবে সামরিক শক্তির সাহায্যে লাউগ্রামের ক্ষুদ্র মল্ল রাজ্যের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয় মল্লভূম রাজ্য।
মল্ল রাজারা ছিলেন সৎ, ধর্মপরায়ণ,এবং প্রজাবৎসল। মল্লরাজাদের রাজত্বকালে মল্লভূম শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জনৈক গবেষক বলেছেন, "মল্লভূমে মল্লরাজাদের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় এবং ঐতিহ্যমন্ডিত অধ্যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা সকল দিকেই ঘটেছিল মল্লভূমের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মল্লরাজাদের শাসনকার্য পরিচালনার মূল নীতি ছিল ধর্ম, ন্যায় পরায়ণতা, সততা, বদান্যতা ও প্রজানুরঞ্জন।"[২]

বাঁকুড়া জেলার রাজবংশের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের পটভূমিতে বিস্তৃত। প্রাচীনকাল থেকেই এই জেলা বিভিন্ন রাজাদের পদধ্বনিতে মুখরিত। আর বাঁকুড়ার রাজবংশের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে নামটি চলে আসে, সেটি হল মল্লভূম রাজবংশের কথা। বাঁকুড়া জেলার রাজপরিবারের আদি ইতিহাস এক সমৃদ্ধ ও গৌরবময় কাহিনি যা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মল্লভূম রাজপরিবার, যা বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী রাজবংশ, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদিমল্ল। মল্ল রাজবংশের শাসনকালে মল্লভূম একটি সুসংগঠিত এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল।[৩]

৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন আদিমল্ল সিংহাসন আরোহণ করেন । ধীরে ধীরে মল্ল বংশ বিস্তার লাভ করে। আদিমল্লের পরে শুরু হয় জয়মল্লের রাজত্ব ৭১০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ৭২০ খ্রিস্টাব্দে বেণুমল্লের রাজত্বের শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কিনুমল্লের রাজত্ব ৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে। ইন্দ্রমল্লের রাজত্ব ৭৪২ খ্রিস্টাব্দে। ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে কানুমল্লের রাজত্বের সূচনা হয়

মল্লবংশে। এরপর ধমল্ল, শুরমল্ল, কনকমল্ল, কন্দর্পমল্ল, সনাতনমল্ল, খড়গমল্ল, দুর্জনমল্ল, যাদবমল্লের রাজত্ব চলে ৯০৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি। এরপর আরওকয়েক জন রাজার রাজত্বের পর ১০০৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় অনন্তমল্লের রাজত্ব। ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশমল্লের রাজত্বের সূচনা ঘটে। ১১০২খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় প্রতাপমল্লের রাজত্ব। এরপর ১১১৩, ১১২৯, ১১৪২, ১১৫৬, ১১৬৭, ১১৮৫, খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে রাজত্ব চলেছিল সিন্দুরমল্ল, সুখময়মল্ল, বনমালীমল্ল, যদুমল্ল, জীবনমল্ল, এবং রাজা রামমল্লের। ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দমল্ল, ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে তপঃমল্ল, ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে মদনমল্ল। এরপর বীরমল্ল ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে, ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে ধাড়ীমল্ল, এবং ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে হাম্বিরমল্ল, ১৬২০খ্রিস্টাব্দে মল্লবংশে রাজত্ব করেছেন ধাড়ী হাম্বির মল্লদেব। ১৬২০ শেষে ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভাব ঘটে রঘুনাথ সিংহদেবের। এরপর ১৬৫৬, ১৬৮২, ১৭০২, ১৭১২, ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ক্রমে রাজত্ব করেছেন বীরসিংহ দেব, দুর্জন সিংহদেব, ২য় রঘুনাথ সিংহদেব, গোপাল সিংহদেব এবং চৈতন্য সিংহদেব। পরবর্তীকালে বহু রাজা রাজত্ব করেছেন। মল্ল বংশের রাজারা ইতিহাসের পাতায় উল্লেখযোগ্য কারণ এই রাজারা দীর্ঘকালে তাদের সিংহানের অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। ৫৬ জন মল্ল রাজার কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। ৬৯৪ থেকে ১৮০২ সাল অবধি তারা রাজত্ব করেছেন।[৪]

কিন্তু বাঁকুড়া জেলার স্বনামধন্য গবেষক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী 'বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি' গ্রন্থে ৫৬ জন মল্ল রাজার উল্লেখ করেলেও Wikipedia-তে ৬৩ জন মল্ল রাজার নাম পাওয়া যায়। এবং গবেষক সঞ্চিতা পাল তাঁর বাংলার রাজবাড়ির ইতিহাস গ্রন্থে ৬২ জন রাজার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫]

তুঙ্গভূম:- পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় দামোদর দারকেশ্বর এবং কংসাবতী উপত্যকা অঞ্চলে জনগোষ্ঠী সমূহের সর্দারদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেগুলি ভূমরাজ্য নামে পরিচিত। ভূমরাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তুঙ্গভূম রাজ্য । মধ্যযুগে শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুশমা সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই তুঙ্গভম রাজ্য।তুঙ্গভুম রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কিত ও ম্যালির বিবরণ মূলত জনশ্রুতিভিত্তিক ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জেলা গেজেটিয়ার্সে তিনি যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে জানা যায় রাজগ্রাম রাজ্যের অবলুপ্তির পর তুঙ্গ ভূম রাজ্যের উদ্ভব ঘটে । শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুশমা, রাইপুর, সিমলাপাল ভেলাইডিহা সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল রাজগ্রাম রাজ্য। অল্প কিছু কালের মধ্যেই রাজগ্রাম রাজ্যের রাজা সপরিবারে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এইভাবে রাজগ্রাম তথা সামন্তসার রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই রূপ পরিস্থিতিতে নকুড় নামক স্থানীয় এক সর্দার ওড়িষ্যা থেকে আগত শ্রীপতি মহাপাত্র নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তির সহায়তায় তুঙ্গভূম রাজ্য স্থাপন করেন এবং রাজা ছত্রনারায়ণ দেব নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন ।

তুঙ্গভূমের উৎপত্তি সংক্রান্ত অপর যে কিংবদন্তিটি প্রচলিত রয়েছে সেটি হল গণ্ডকী নদীসংলগ্ন এলাকা থেকে তুঙ্গদেব তীর্থ দর্শন এর জন্য জগন্নাথ ধামে উপস্থিত হলে প্রভু জগন্নাথের কৃপায় পুরীধামের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তুঙ্গদেবের পৌত্র গঙ্গাধর তুঙ্গ প্রভু জগন্নাথের নিকট থেকে এই মর্মে নির্দেশ পান যে তার কোন উত্তরসূরী আর পুরীর রাজপদ পাবেন না তার পুত্র অন্যদেশে গিয়ে সেখানকার রাজা হতে পারবেন। এবং তাকে নাম পরিবর্তন করে সেখানকার রাজ সিংহাসনে বসতে হবে। উক্ত নির্দেশ মতাবেক গঙ্গাধর তুঙ্গের পুত্র নকুড়তুঙ্গ নাম ধারণ করে ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে কিছু ধনরত্ন ও সৈন্য সামন্ত নিয়ে স্বপত্নিক পুরী ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ সময় পরিভ্রমণের পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে টিকরপাড়ায় এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে বসতি গড়ে তোলেন। এরপর কুট বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ উৎকল ব্রাহ্মণ শ্রীপতি মহাপাত্রের সহায়তায় নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছত্রনারায়ণ দেব নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রভু জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য তাই প্রভুর নাম অনুসারে রাজ্যের নাম রাখা হয় জগন্নাথপুর।

সামন্তভূম:-পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার দামোদর, দারকেশ্বর, কংসাবতী উপত্যকায় যে সমস্ত ভূম রাজ্য গুলি গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সামন্তভূম। ভবিষ্যপুরাণ অনুসারে রাজ্যটির রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষ বৈচিত্রপূর্ণ না হলেও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার দিক থেকে রাজ্যটির অবস্থান ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্রিটিশ

রাজত্বকালে যে অঞ্চলটি ছাতনা পরগনা নামে পরিচিত ছিল মধ্যযুগে সেই অঞ্চলটি ছিল সামন্তভূম। রাজ্যটি আটকোশী পরগনা নামেও পরিচিত ছিল। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে এর আয়তন ছিল ষোলোমাইল । বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ছিল সামন্ত ভূমির আওতাভুক্ত এলাকা । এছাড়া শালতোড়া ও মেজিয়ার কিয়দংশ এবং ইদগামাহাল্লা পাটপুর লোকপুর প্রভৃতি অঞ্চলও সামন্ত ভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

ছাতনা নামের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়টির ওপর দৃষ্টি রাখলে দেখা যায় এবিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে । কারো কারো মতে নামটির শব্দ বিপর্যয় ঘটেছে । নামটি ছিল ক্ষত্রিয় বা ছত্রীরাজ প্রতিষ্ঠিত ছত্রিনাং নগরম্ এর থেকে হয়েছে ছত্রিনা নগর এবং ছত্রিনা নগর থেকে সংক্ষিপ্ত রূপে হয়েছে ছত্রিনা । এবং পরে তা উচ্চারণের তির্যকতায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাতনা। তবে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয় কেননা রাজধানীর নামের শেষে যুক্ত গ্রাম নগর বা পুরের অবলুপ্তি বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত কোন ভূম রাজ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি ।

ছাতনা নামের উৎপত্তি সংক্রান্ত ভিন্ন মতটি হল একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাল সম্রাট নয়পালের ইর্দালিপি অনুসারে ছত্তিবন্না গ্রাম হল ছাতনার পূর্বেকার নাম। আবার অনেকে মনে করেন ছাতিম বা ছাতনি শব্দ থেকে ছাতনা নামটির উৎপত্তি হয়েছে। একসময় এই অঞ্চল ছাতিম বা ছাতনি গাছে পরিপূর্ণ ছিল বলে অনেকের অভিমত। বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে এই অঞ্চলে গভীর অরণ্যের অস্তিত্বের কথা বর্ণিত রয়েছে ।

সামন্তভূম রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছে মূলত সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায় থেকে বলে অনেকে মনে করেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শঙ্খ রায়। অনেকে মনে করেন তিনি ছিলেন কোন শাসকের অধীনস্ত সামন্ত বা সেনাপতি । পরে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বাহুবলে সামন্তভূমের প্রথম রাজা রূপে সিংহাসনে বসেন।

শঙ্খ রায়কে কেন্দ্র করে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন দিল্লি সম্রাটের সেনাপতি ছিলেন শঙ্খ রায়। সম্রাটের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি নিজ ভূমি বাহুলানগরে ফিরে আসেন। এরপর ১৪০৩ সালে তিনি গড়ে তোলেন সামন্তভূম রাজ্য।
বাহুলানগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন বাসুলী দেবী। তিনি শঙ্খ রায়কে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন ছাতনা গ্রামের তাদের বাসস্থান গড়ে তোলার এবং তার পৌত্রের আমলে তিনি বোলপুকুরে আবির্ভূত হওয়ার আশ্বাসবাণী দিয়েছিলেন। এই আশ্বাসবাণী পাওয়ার পর শঙ্খ রায় ছাতনায় বাসস্থান গড়ে তোলেন এবং এই ভাবেই বিকশিত হয় সামন্তভূম রাজ্য।

ধবলভূম:- ধবলভূম রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল বাঁকুড়া জেলার সুপুর এবং অম্বিকানগরকে কেন্দ্র করে। সপ্তদশ শতকে সুপুর এবং অম্বিকানগর খাতড়া রাণীবাঁধ থানা অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই রাজ্যটি । সুপুর ছিল এই ধবলভূম রাজ্যের শাসনকেন্দ্র। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন চিন্তামণি ধবলদেব। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি ছিলেন রজক বংশজাত। তাঁর পদবী ছিল 'ধোবা'। তাঁর পদবী অনুসারে রাজ্যের নাম হয় ধবলভূম এবং রাজোপাধি হয় ধবলদেব ।

জনশ্রুতি আছে চিন্তামণি ধবলদেব নিজের রাজ্য গড়ে তোলার জন্য বিকল্প শক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন । তিনি পাঠান সৈন্যদের সাহায্য নিয়েছিলেন স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। পরবর্তীকালে পাঠানরা খাতড়া অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। খাতড়া গ্রামের নামটি এসেছে খাঁদের তড়া থেকে বলে অনেকের আভিমত ।

বাঁকুড়া জেলার ধবলভুম এবং বিহারের ধলভূমগড় দুটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কিংবদন্তির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় দুটি ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ধোবা বা রজক সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি এবং পরবর্তীকালে উক্ত ধোবা বা রজক রাজ পরিবারের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশের প্রতিষ্ঠা । এছাড়া উভয় রাজ্যেই দেবী রঙ্কিনীর উপাসনা প্রচলিত ছিল যা এখনো বিদ্যমান। দেবী রাঙ্কিনীর পূজা প্রচলন সংক্রান্ত যে কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে সেটা হল আদিতে দেবী

ছিলেন একজন রাক্ষসী একদা পঞ্চকোটের এক দৈত্য শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দেবীর পশ্চাৎ ধাবন করলে দেবী সুবর্ণরেখা নদীতটে এক ধোবা বা রজকের আশ্রয় নিয়ে তার বস্ত্রপুঞ্জে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেন এবং এর পুরস্কার স্বরূপ দেবীর সহায়তায় রজক রাজা হন। এবং দেবী রাজার কুলোদেবীর আসন গ্রহণ করেন ।

সুপুর অম্বিকানগর খাতড়া রানীবাঁধ সংলগ্ন অঞ্চলে জৈন আধিপত্যের বিস্তার প্রসঙ্গে বলা যায় ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ জৈনধর্মাবলম্বী চোড়গঙ্গ রাজের অধিকারভুক্ত হয়েছিল সুপুর অম্বিকানগর খাতড়া রানিবাঁধ সহ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ফলস্বরূপ উল্লিখিত অঞ্চলে জৈন আধিপত্যের বিস্তার ঘটে । কংসাবতী নদী উপকূলবর্তী অঞ্চলে জৈন স্মারক গুলির প্রবল উপস্থিতি একথা প্রমাণ করে যে একদা এই অঞ্চলে জৈন ধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। জৈন ধর্মের বিস্তৃতির সাথে সাথেই এই অঞ্চলে জৈন বণিক সারক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে যাদের সহায়তায় এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।[৬]

জগন্নাথ দেও-এর ধবলভূম রাজ্যের সিংহাসন আরোহণ : জগন্নাথ দেও-এর রাজ্য গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে নানান আভিমত প্রচলিত রয়েছে বাঁকুড়াতে। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন তিনি রাজপুতানার ঢোলপুরের বাসিন্দা। তিনি জগন্নাথ ধাম থেকে তীর্থ সেরে ফেরার পথে কটকে যান। সেখানে নবাবের দরবারে গিয়ে নবাবের সঙ্গে দেখা করেন। নবাব তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শাহজাদা বলে সম্বোধন করেন। শাহজাদা উপাধি বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি নবাবের কাছে নিজ রাজ্য গড়ার অনুরোধ জানান। নবাব তাঁকে এক দল সৈন্যবাহিনী প্রদান করেন। সেই সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে তিনি সুপুরের চিন্তামণি ধোবাকে যুদ্ধে পরাজিত করে জগন্নাথ দেও শাহজাদা ধবলদেব উপাধি ধারন করে ধবলভূমে সিংহাসনে বসেন। এবং এই ভাবেই বিকশিত হয় ধবলভূম রাজ্য।

উপসংহার:-সভ্যাতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে অতীতকে জানার গভীর আগ্রহ বিদ্যমান ছিল। কারণ, অতীতের মধ্যেই রয়েছে ইতিহাসের উপাদান। ইতিহাস হল এমন একটি বিদ্যা, যা অতীতের ঘটনার আলোকেই সমাজবদ্ধ মানবজীবনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। অপরদিকে, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা ও অভিব্যক্তির যে রূপ প্রতিফলিত হয়, তাকেই বলা হয় সংস্কৃতি। এই গবেষণায় বাঁকুড়া জেলার রাজতান্ত্রিক ইতিহাসের অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস করা হয়েছে এবং আলোকপাত করা হয়েছে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা বাঁকুড়া জেলার আঞ্চলিক রাজ পরিবার গুলির উদ্ভব ও বিবর্তনের কাহিনীটির ওপর ।

তথ্যসূত্র :-

১। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা-১১
২। সরকার ড. প্রসেনজিৎ, বাঁকুড়া : সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপরেখা, সন্ধ্যা প্রকাশনী, শারদীয়া ১৪৩০, পৃষ্ঠা-৯৬
৩। চন্দ্র মনোরঞ্জন, মল্লভূম বিষ্ণুপুর, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ২০০২, পৃষ্ঠা-১৩৬

৪। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস- সংস্কৃতি পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা-৭১
৫। পাল সঞ্চিতা 'বাংলর রাজবাড়ির ইতিহাস' এশিয়ান পাবলিকেশন কলকাতা বইমেলা ২০১৯ পৃষ্ঠা-৬৫-৬৭
৬। পোড়েল সুদীপ্ত, ধবলভূমের ইতিহাস, বাঁকুড়ার খেয়ালি পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৪০